সাংবাদিকের কলমে • আলোকচিত্রীর চোখে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

শুভাশিস মৈত্র

আলোকচিত্র

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় • অমিত ধর

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকার পরিবর্তে		
বাম ৩২-এ মমতামঙ্গল	শুভাশিস মৈত্র	৭
মমতা : গোড়ার কথা	তাপস গঙ্গোপাধ্যায়	১৯
মমতা : এক এবং অনন্যা	শুভা দত্ত	২৭
মমতা এখন অনেক বেশি উদারপন্থী	জয়ন্ত ঘোষাল	৩১
মমতা : রাজনীতির মূল্যায়ন	দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী	৪৭
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	রজত রায়	৫৯
মমতা-বিজেপি : এক অস্থির অধ্যায়	গৌতম হোড়	৬৯
তৃণমূল কংগ্রেস কোন শ্রেণির দল?	দেবাশিস ভট্টাচার্য	৮১
জমির আন্দোলন এক নতুন প্রতিশ্রুতি		
যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রাখতে হবে	অমল সরকার	৯১
লেখাটা শেষ হল না	কুণাল ঘোষ	১০৯
পরিবর্তনের তিন অধ্যায়	দেবারুণ রায়	১১৫
রণক্ষেত্রে এক উদাসিনী সন্ন্যাসিনী	মিহির গঙ্গোপাধ্যায়	১২৫
মমতার রাজনীতি বামেদের থেকে কতটা আলাদা?	বিশ্বজিৎ রায়	১৩৭
মমতা হয়ে ওঠা	বিশ্বজিৎ সিংহ	১৫৩
মমতা চরিত	মনোজিৎ মিত্র	১৫৭
পরিবর্তনের আটকাহন	সুমন দে	১৬৫
অতি সাধারণ মমতা	আনন্দ সেন	১৭৯
মমতা—সাফল্যে, ব্যর্থতায়	রন্তিদেব সেনগুপ্ত	১৮৯
গানের দল বদল	কুশল দাশগুপ্ত	২০৩
মিডিয়া—শক্তি নয়, মানব-শক্তিতে বিশ্বাসী	পুষন গুপ্ত	২০৯
তিনি বাউল্যার 'ডাক' করতে শিখে গেছেন	অনিন্দিতা চৌধুরী	২১৩
অশোক দাশগুপ্তের চিঠি		২২৩

ভূমিকার পরিবর্তে : বাম ৩২-এ মমতামঙ্গল

শুভাশিস মৈত্র

অন্য রাজ্য যদি পারে তা হলে আমরা পারি না কেন?

২০০৯ সালের বাজেটের আগে যে ইকনমিক সার্ভের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ৯ শতাংশের বেশি মানুষ দু'বেলা খেতে পায় না। ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গই দেশের মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে। এরপরই আছে ওড়িশা। সেখানে ৫ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ দু'বেলা খেতে পায় না। তারপর প্রায় এক বছর কেটে গেল। এখনও পর্যন্ত সংসদে এই রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেননি বামপন্থীরা। ২০০৭ সালে প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারেও বছরে কয়েকমাস অর্ধাহারে থাকা গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা এ রাজ্যেই সব থেকে বেশি। প্রতি হাজার পরিবারে ১০৬টি পরিবার, অর্থাৎ ১০.৬ শতাংশ পরিবার বছরে কয়েক মাস অর্ধাহারে থাকেন। এর ঠিক নীচেই রয়েছে ওড়িশা, ৪.৮ শতাংশ। আর সারা বছর জুড়েই যারা পেট ভরে খেতে পান না, সেই তালিকার শীর্ষে অসম, তারপরই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যের সঙ্গে একই অবস্থানে রয়েছে ওড়িশাও। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার ০.২ টন বছরে। দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান। তবু এমন হচ্ছে, কারণ মূলত খেতমজুররাই খেতে পাচ্ছেন না। শিল্পায়ন না হলে যাদের দু'বেলা খাবার নিশ্চিত হবে না। আবার খেতমজুররাই শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের সব থেকে বেশি বিরুদ্ধে। এইখানেই আসে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন। শিল্পায়ন হলে তাঁদের ভালো হবে, বামফ্রন্ট সরকারের এই বক্তব্যে তাঁদের

আস্থা নেই। এবার শিক্ষা। কী শাসক দল, কী বিরোধী দল, এ রাজ্যের ভোটে শিক্ষা কখনোই ইস্যু নয়। অথচ সমীক্ষা বলছে এ রাজ্যে শিক্ষা চিত্র ভয়াবহ। এ রাজ্যে প্রথম শ্রেণিতে যত জন ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়, তার মাত্র ২২ শতাংশ পৌঁছোয় দশম শ্রেণিতে। অর্থাৎ, ৭৮ শতাংশ ড্রপআউট। স্কুলছুটদের তালিকায় আমাদের পিছনে আছে মাত্র তিনটি রাজ্য। বিহার, সিকিম, মেঘালয়। ২০০৯ সালেই, বাজেটের ঠিক পর পরই, মন্ত্রী কুমারী শেলজা রাজ্যসভায় এক বিবৃতিতে বলেন, এই দেশে সব থেকে বেশি গৃহহীন মানুষ বাস করে কলকাতা শহরে। তারপর মুম্বই। তারপর চেন্নাই। ২০০৯-এর আগস্টের আউটলুকের একটা সংখ্যায় দেখলাম, হরিয়ানা সরকার রাজ্যের সমস্ত তফসিলি পরিবারের বাড়িতে ট্যাপওয়াটার পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। অন্তত একটি জলের লাইন পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের সব গ্রামে। একটাই সহজ প্রশ্ন। অন্য রাজ্য যদি পারে তা হলে আমরা পারি না কেন?

১৯৭৩ সালে অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। ২০০৪-০৫ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, অন্ধ্রে বি পি এল ১১ শতাংশ, আর এ রাজ্যে ২৫-২৮ শতাংশ। আমরা পারি না কেন? অন্ধ্রে তো কোনো বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় ছিল না। তা হলে ৩২ বছরে আমাদের বামপন্থী সরকারের মন্ত্রী এবং নেতারা করলেনটা কী? আরও কথা, দারিদ্র কমাতে বা গ্রামে গ্রামে জল পৌঁছে দিতে সরকারে বামপন্থীদের থাকাটা আবশ্যিক শর্ত নয়। অন্তত সি পি এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গত ৩২ বছরে রাজ্যবাসীর কাছে এটাই প্রমাণ করেছে।

৩২ বছরে

যে বামপন্থীরা ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে প্রায় প্রতিদিনই বলতেন তাঁদের সরকারকে ফেলে দেওয়া হবে, ক্ষমতায় থেকে থেকে তাঁরাই এক সময় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে চিরস্থায়ী। এ ভাবে ৩২ বছর চলার পর রাজ্যে পালাবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দেশে প্রথম বামপন্থী সরকার তৈরি হয়েছিল আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৫৯ সালে। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের সেই সরকারকে সে দিন সত্যিই অন্যায়ভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কেরলে বাম সরকার বারবার ক্ষমতায় এসেছে। ভোটে হেরে বিদায়ও নিয়েছে বার বার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৭৭-এর পর থেকে একেবারেই অন্য খাতে বইতে থাকে। এক টানা ৩২ বছর শাসনের পর ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের ফল বলে দিল চরায়

আটকে গিয়েছে বামফ্রন্টের জাহাজ। এই চরা কতটা দুর্নীতির, কতটা অপশাসনের, কতটা আদর্শের সংকট সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব

১৬ আগস্ট, ১৯৯০। ভবানীপুরে মাথায় রড দিয়ে মারা হল মমতাকে। সকালে যখন ঘটনা ঘটছে, কাছেই পুলিশ ছিল। অথচ, সন্ধ্যায় আমরা যখন জ্যোতিবাবুকে মহাকরণে এ বিষয়ে জানতে চাই, তিনি বলেন, 'বন্ধ বিরোধীরা তাকে মেরেছে।' তখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। সান্ধ্য কাগজে লালু-বাদশা আলমদের নাম বেরোল। তারপর রাতে গ্রেফতার। পরে খোঁজ নিয়ে যত দূর জানা গেছে, সেটা ছিল খুনেরই চেষ্টা, তবে পুলিশ দোষীদের ঘটনাস্থলে না ধরলেও, এক ইনস্পেক্টর রিভলভার বের করে লালু আলমকে তৃতীয়বার আঘাত করা থেকে বিরত করতে পেরেছিলেন। এ ঘটনার উল্লেখ এ জন্য জরুরি, ১৯৮৪ তে সাংসদ হয়ে মাত্র ছ'বছরের মধ্যে তিনি সিপিএমের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন। মমতার তীব্র সিপিএম বিরোধিতার অনেক কারণের মধ্যে এটা অন্যতম।

সিপিএমের ৩২ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকার রহস্যটা কী? এক-কথায় বলতে গেলে সমীকরণটা এরকম—বিরোধী অনৈক্য + শ্রমিক কৃষক সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন + ভূমি সংস্কার + জ্যোতি বসু + প্রয়োজন মতো ভোটে চুরি + মাসল পাওয়ার। বিরোধী ঐক্য বাড়ছিল, সংগঠন দুর্বল হচ্ছিল,সমর্থনে ক্ষয় দেখা দিচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে মাসল পাওয়ারের প্রয়োজন। ধরা যাক ভোটে চুরি। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কেশপুর। এই বিধানসভা কেন্দ্রে এক সময়ে এক লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছেন সিপিএমের নন্দরানি ডল। পরে নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি হতেই দেখা গেল জয়ের ব্যবধান ৩০ হাজারের নীচে নেমে এল।

মাসল পাওয়ার। মাসল পাওয়ার কাজ করতে ব্যর্থ হলে কী হয়, তা বোঝা গেল ২০০৯ লোকসভা ভোটে তড়িৎ তোপদারের পরাজয়ে।

এই পরিবর্তনগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তিনি করেছেন, জমি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। এ সব প্রশ্নের উত্তর তিনি এখনো দেননি, তবে এই তুলে ধরাটাও এক বিরাট কাজ। সারা দেশ জুড়েই এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। ইংরেজদের তৈরি আইন মেনে চলব, না গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকের ইচ্ছে অনিচ্ছেকে সম্মান

জানাব, এই প্রশ্নটা সামনে এনে ফেলেছেন মমতা। সেনাবাহিনী, শিক্ষা, হাসপাতাল, রাস্তা, রেলপথের জন্য জমি অধিগ্রহণকে জনস্বার্থ বলব, আবার টাটাদের জন্য জমি অধিগ্রহণেও জনস্বার্থের যুক্তি দেখাব, এটা নীতিগতভাবে ঠিক কিনা, সে প্রশ্নটাও দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজে আলোচনার মধ্যে এনে ফেলেছেন তিনিই। এখানেই তাঁর গুরুত্ব।

সিপিএম প্রকাশ্যে কখনোই মমতাকে গুরুত্ব দেয়নি। মনে পড়ে ১৯৯৮ সালের লোকসভা ভোটের কথা। তার আগে পর্যন্ত প্রবাদ ছিল, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে কেউ পর পর দু'বার জিততে পারে না। মমতা সেই প্রবাদ চূর্ণ করলেন। ১৯৯১ সালে এই কেন্দ্রে মমতা জিতেছিলেন ৯০ হাজার ভোটে। ১৯৯৬ সালে এই কেন্দ্রে মমতা জিতলেন ১ লক্ষ ৩ হাজার ভোটে। আর ৯৮ সালে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ভোটে। ৯৮ সালে ত্রিমুখী লড়াই হয়েছিল। অন্য প্রার্থীরা ছিলেন, কংগ্রেসের সৌগত রায় এবং সিপিএমের প্রশান্ত শূর। মনে পড়ে, প্রশান্ত শূর সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'মমতা ইজ নো ফ্যাক্টর, লড়াই সৌগত রায়ের সঙ্গে'। ভোটের পর দেখা গেল, সৌগতর জামানত জব্দ। আর মমতা প্রশান্ত শূরকে হারিয়েছেন ২ লক্ষ ২৩ হাজার ভোটে। এই যে 'মমতা ইজ নো ফ্যাক্টর'— এই কথাটা সিপিএম বহুদিন ধরে বলে চলেছিল। যদিও আজ আর বলছে না। আজ বুদ্ধদেববাবুকে মমতার বিরুদ্ধেই নালিশ জানাতে হচ্ছে মনমোহন সিংয়ের কাছে।

সিপিএমের ভুল

ইংরেজিতে বলা হয় TINA। দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ। যে মার্কসবাদীরা দেওয়ালে লিখতেন মার্কসবাদ অভ্রান্ত, কারণ মার্কসবাদ বিজ্ঞান, তাদেরই দেখা গেল টিনা রোগে আক্রান্ত হতে। বড়ো বড়ো কর্পোরেট সেক্টরের হাত ধরা ছাড়া উন্নয়নের আর কোনো উপায় নেই, পথ নেই। মার্কসবাদীরা বললেন, উন্নয়নের এই হল অভ্রান্ত পথ। অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ি তার বই, 'দ্য ফেস উই ওয়্যার অ্যাফরেড টু সি' বইয়ে বলেছেন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের নামে রাজ্য সরকারগুলি কর্পোরেট সংস্থার এজেন্টে পরিণত হচ্ছে। ঝুঁকি নেবে সরকার, আম আদমিকে বঞ্চিত করে সস্তায় জমি, বিদ্যুৎ, জল-সহ উৎপাদনের নানা উপকরণ কম দামে জোগান দেবে সরকার, আর লাভের টাকা নিয়ে যাবে কর্পোরেট সংস্থা। কী রকম লাভ? অমিত ভাদুড়ির মতে, আমাদের জিডিপি রেটের চেয়ে তিনগুণ বেশি। কী করে এমন ঘটে? তার কারণ, এই লাভ শুধু সারপ্লাস ভ্যালু নয়, বাজারদরের চেয়ে সস্তায় পাওয়া উৎপাদনের বেশ

কিছু উপকরণ, যার জোগান দিয়েছে সরকার। আর সে কারণেই টাটাদের সঙ্গে চুক্তি প্রকাশ করতে বাম সরকারের এত ভয়। মুখে বলা হচ্ছে, ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই। দলীয় মুখপত্রে এমন কথা একাধিক বার লিখেওছেন নিরুপম সেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা। উন্নয়নের এই মডেলের ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। তা হলে বোঝা যাবে, কেন মানুষ এ কাজে কোনো সরকারকে বিশ্বাস করে না। "Report of An Expert Group to Planning Commission : Development Challenges in Extremist Affected Areas, 2008"-এ বলা হয়েছে "An official database of persons displaced/affected by projects is not available. However, some unofficial studies, particularly by Dr. Walter Fernandes, peg this figure at around 60 million for the period from 1947 to 2004, involving 25 million ha. which includes 7 million ha of forest and 6 million ha. of other Common Property Resources (CPR). Whereas the tribals constitute 8.08% of country's population, they are 40% of the total displaced/affected persons by the projects. Similarly at least 20% of the displaced/affected are Dalits and another 20% are OBCs. The settlement record is also very dismal. Only a third of the displaced persons of planned development have been resettled."

এভাবেই, এ রাজ্যেও যখন শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ হতে থাকল, দেখা গেল, সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। এই কৃষকেরাই বিদ্রোহ করেছেন সিপিএমের বিরুদ্ধে। সন্ন্যাসি বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, ওয়াহাবি, অথবা তিতুমির, ভারতের রাজনীতিতে কৃষক বিদ্রোহ বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আজ তার আঁচে পুড়ছে সিপিএমও। যদিও এই কৃষকের আশির্বাদেই ৩২ বছর ক্ষমতায় টিকে ছিল সিপিএম। কর্পোরেট বাহিত উন্নয়নের এই যে মডেল, তার গতি রুখে দিয়েছেন মমতা। এ এক ঐতিহাসিক কাজ। কিন্তু বিকল্প মডেল কী হবে তা আমরা এখনো জানতে পারিনি মমতার কাছ থেকে।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, নন্দীগ্রামের আন্দোলনের জন্মদাতা কিন্তু মমতা নন, স্থানীয় স্তর থেকে উঠে আসা এক আন্দোলনকে মমতা সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, আন্দোলনকারীরাও মমতার উপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। সেটাই বড়ো কথা। নন্দীগ্রামই প্রথম প্রমাণ করল, সিপিএম শেষ কথা নয়। সরকার, ক্যাডার, অস্ত্রবল, পুলিশের যৌথ শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব, দেখাল নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের আগুনেই নতুন করে জেগে উঠেছিল সিঙ্গুর। এই